বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে 'কুড়াল মারা' নীতি এবং জনপ্রতিরোধ: একটি পর্যালোচনা

ওমর ফারুক

সামরিক শাসনের সময়কাল (১৯৯০ পর্যন্ত) বাদ দিয়ে 'ফরমাল গণতন্ত্র'র যে আমল ১৯৯১ থেকে যাত্রা শুরু করেছে, তাতে জ্বালানি খাতের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা যায় যে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো, যারা ১৯৯১-পরবর্তী কালে সরকার চালিয়েছে, তারা জ্বালানি খাতে বহু ক্ষেত্রে দেশের জন্য সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেগুলোকে আমরা 'কুড়াল মারা' নীতি বলতে পারি। পাশাপাশি ১৯৮৬ সালের হরিপুর তেলক্ষেত্র নিয়ে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা থেকে শুরু করে আজকের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত জনপ্রতিরোধ চলমান আছে।

আশির দশকে বাপেক্সের আবিষ্কৃত হরিপুর তেলক্ষেত্র ভুঁইফোড় কোম্পানি সিমিটারকে ইজারা দেয়া জ্বালানিক্ষেত্রে 'কুড়াল মারা' কর্মের একটা ক্লাসিক উদাহরণ। সিমিটারের দেশীয় এজেন্ট বেক্সিমকোর কর্ণধারের লবিতে তৎকালীন সামরিক সরকার সমস্ত আইন-কানুনের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এ কাজটি করেছে। একে কেন্দ্র করে যুব ইউনিয়নের উদ্যোগে দেশের জ্বালানিসম্পদ রক্ষার সামাজিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে; আন্দোলনের প্রথম লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয় এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে। পরে জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠলে একটা নাগরিক কমিশন বেসরকারিভাবে এটি তদন্ত করে বিস্তর অনিয়ম চিহ্নিত করে।[১] পরবর্তীতে সরকার বাধ্য হয়ে ইজারা বাতিল করেছে। এটি নাগরিক আন্দোলনের একটি বড় সফলতা, যা 'কুড়াল মারা' কর্মকে প্রতিহত করতে পেরেছে।

সামরিক আমলের আরেকটি ভয়াবহ 'কুড়াল মারা' কর্ম কোনোভাবেই প্রতিহত করা যায়নি। সেটা হলো কাফকো সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের যে কেলেঙ্কারি হয়েছে তা। অদ্ভুত এক ফর্মুলা ব্যবহার করে গ্যাসের দাম ঠিক করা হয়েছে। তখনকার শিল্প সচিব এই প্রকল্পে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করেছেন বলে জ্বালানি বিশ্লেষকগণ নানা সময়ে আলোচনা করেছেন। ওই সচিব পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের আমলে মন্ত্রী থাকাকালে ২০০৫ সালে নাইকো থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য মাত্র ৫০০০ ডলার ও একটি দামি টয়োটা গাড়ি ঘুষ হিসেবে নেয়ার দায়ে পদত্যাগ করেছেন। টেংরাটিলা দুর্ঘটনার হোতা নাইকো কানাডার আদালতে দোষী হয়ে বিশাল অঙ্কের আর্থিক দণ্ড দিলেও বাংলাদেশে কাউকে এজন্য বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি। এ নিয়ে একটা দারুণ মিল দেখা যায় বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। বাংলাদেশের এক জ্বালানি বিশেষজ্ঞের মতে (যিনি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নানা কর্মে প্রায়ই বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন), কাফকোর গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের জন্য যে অদ্ভুত এক ফর্মুলা ব্যবহৃত হয়েছে গত ২০ বছর ধরে, তার উৎপত্তিস্থল কোথায় তা তিনি অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেননি।[২] ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল; কেননা এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার ছিল যে ওই প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য নয়, বরং জাপানের সরকারি সহায়তার আড়ালে জাপানিসহ আরো কিছু বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে বাংলাদেশে প্রাপ্ত স্বল্প মূল্যের গ্যাসকে।[৩] বিএনপি সরকার গ্যাস সরবরাহের চুক্তি পুনঃপর্যালোচনা করার জন্য জাইকা তথা জাপানের কাছে দেনদরবার করেছে। জাপানের ধমকে বাংলাদেশের সরকার পিছু হটেছে। টোকিওতে এক মিটিংয়ে তখনকার অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাপানি প্রতিনিধিকে জানালেন যে কাফকোতে গ্যাস সরবরাহ করলে চট্টগ্রাম শহর অন্ধকারে রাখতে হবে। উত্তরে জাপান জানিয়েছে যে দরকার হলে বাংলাদেশকে তা-ই করতে হবে; নইলে বাংলাদেশে জাইকার সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে।[৪] বৈদেশিক সহায়তার আড়ালে উন্নত দেশের কর্পোরেট স্বার্থে গরিব দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের এক চমৎকার উদাহরণ এই কাফকো প্রকল্প। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের নামে এসব দেশের সরকারসমূহ এই লুণ্ঠন মেনেও নেয়।[৫] সেজন্য মাঝেমধ্যে কাকুতি-মিনতি করলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়।

বিশ্বব্যাংক ১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় খাতের কবজা থেকে বের করে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড বিদেশি কোম্পানিগুলোর অধীনে আনার ব্যাপারে নীতি প্রণয়নের কাজ করছিল। সেজন্য ১৯৯৩ সালের জাতীয় পেট্রোলিয়াম নীতি; ১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতি; এবং ওই সময়ে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পেট্রোবাংলার উদ্যোগে ঢাকা, লন্ডন ও হিউস্টনে আয়োজিত পেট্রোলিয়াম প্রমোশন ইভেন্ট নিয়ে তেল-গ্যাস বিষয়ক আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে (অয়েল অ্যান্ড গ্যাস জার্নাল) সংশিষ্ট ব্যক্তিরা উল্লাস প্রকাশ করেছেন। 'ফরমাল গণতন্ত্র'র আমলের প্রথম দিকে বিএনপি বাংলাদেশের জ্বালানি খাতকে বাজার অর্থনীতির এই 'নব্য-উদারনীতি' ধারায় (যা সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে ছোট আকারে যাত্রা শুরু করে) নতুন উদ্যমে বিন্যস্ত করতে শুরু করল। বিএনপির আমলে এ সময়ের প্রথম 'কুড়াল মারা' পদক্ষেপ ছিল তড়িঘড়ি করে ১৯৯৫ সালে কয়েকটি বিদেশি কোম্পানির সাথে করা গ্যাস চুক্তি (পিএসসি)। সে সময় জ্বালানি খাতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর নামে সরকারি সিদ্ধান্ত এমনভাবে নেয়া হয়েছে যে সরকার পেট্রোলিয়াম খাতে বেসরকারি লাইসেন্স প্রদানের যেসব রীতিনীতি নানা দেশে চলে আসছে এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো যাতে অভ্যস্তও আছে ততটুকুও অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়নি। যেমন–এসব চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য অন্য অনেক সুবিধার পাশাপাশি কোনো 'সিগনেচার মানি' কিংবা 'লাইসেন্স ফি' এসব কোম্পানিকে দিতে হয়নি।[৬] একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বাংলাদেশে গ্রামীণফোনের লাইসেন্স দেয়ার সময় আওয়ামী লীগ সরকার কোনো লাইসেন্স ফি নেয়নি। অথচ গ্রামীণফোনের মূল কোম্পানি টেলিনরকে সার্বিয়ায় ব্যবসা করতে ওই দেশের সরকারকে ১.৭ বিলিয়ন ডলার ফি হিসেবে দিতে হয়েছে।[৭]

এ ছাড়াও মাগুরছড়া কাণ্ডের হোতা মার্কিন কোম্পানিকে বাংলাদেশ জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র বলা যায় বিনা মূল্যেই দিয়েছে। দেশীয় কোম্পানি এটির উন্নয়ন করলে এখন বাংলাদেশের প্রাপ্য গ্যাস অতি উচ্চমূল্যে সরকারকে কিনতে হতো না। নানা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পরই আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো 'আনসলিসিটেড' বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তাই বিএনপি সরকারের আমলে করা তাড়াহুড়ার চুক্তিতে (পিএসসি) গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারাই যুক্ত হয়নি (বলা হয়ে থাকে ওই ধারাবিহীন চুক্তিই নাকি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য!)। অথচ ওই ধারার অনুপস্থিতির কারণে মাগুরছড়ায় অগ্নিকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ সরকার মার্কিন কোম্পানি থেকে আদায় করতে পারেনি। জাতিসংঘের বাণিজ্য বিষয়ক সংস্থা এক প্রতিবেদনে বলেছে যে 'অনভিজ্ঞতার কারণে' বাংলাদেশ চরম মূল্য দিয়েছে।[৮] অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এ নিয়ে করা সম্পূরক চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থ যে রক্ষিত হয়নি তা সংশ্লিষ্টরা ভালোভাবেই জানেন।[৯] খেয়াল করা দরকার যে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে জ্বালানি খাত ব্যবস্থাপনায় তেমন গুণগত পার্থক্য নেই।

২০০১-০৩ সময়ে বিএনপি আমলের গ্যাস রপ্তানির নানা চেষ্টা তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নাগরিক কমিটি ও নাগরিক সমাজের নানা প্রয়াসে রুখে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে পুরো মার্কিন প্রশাসন সে সময় ইউনোকলের লবি হিসেবে কাজ করার দুটো শক্তিশালী কারণ ছিল–১. ভারতকে ইরানের কাছ

থেকে গ্যাস কেনা থেকে বিরত রাখতে হলে এ বিষয়ে একটা নৈতিক দায়িত্ব আসে যে কোথা থেকে ভারত গ্যাস পেতে পারে; এ বিষয় মাথায় রেখেই ইউনোকলের বাংলাদেশে আগমন ঘটে। ২. ইউনোকল ১৯৯৭ সালে বার্মার সাথে গ্যাস উন্নয়ন বিষয়ে বিশাল এক চুক্তি করে, যা ক্লিনটন প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে। ফলে ইউনোকলের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, যা কমানোর লক্ষ্যেও বাংলাদেশে তার পক্ষে আমেরিকান লবির কাজ করা দরকার হয়ে পড়ে। সর্বোপরি এই কোম্পানিগুলো সারা বিশ্বে আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের 'পাহারাদার' হিসেবেই কাজ করে।[১০] এছাড়া স্থানীয় লবি গ্রুপ তো আছেই। এই লবি গ্রুপের বক্তব্য এতই তীব্র ছিল যে তার থেকে রেহাই পাননি বিশ্বখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজও। তিনি ঢাকায় এক সেমিনারে এসে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি করা ঠিক হবে না বলে মত দিলে[১১] সে সময়ের কিছু আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ বলেছিলেন যে অধ্যাপক স্টিগলিৎজ ভালোভাবে বিষয়টি বোঝেননি।

বাপেক্সের আবিষ্কৃত ভোলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ১৯৯৭ সালের দ্বিতীয় রাউন্ডের পিএসসি থেকে দরপত্রের বাইরে রেখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ওই ইউনোকলের সাথে তাদের দেয়া এক আনসলিসিটেড প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা শুরু করে। ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট নামে ইউনোকল একটা প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা দেয়; সরকার তাদের সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়; অন্য প্রতিযোগীরা ক্ষুব্ধ হয়–কেন এই গ্যাসক্ষেত্র দরপত্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় না এনে সরকার ইউনোকলকে সুবিধা দিচ্ছে? অন্যদিকে সদ্য তৈরি হওয়া তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটিও এ নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করে। এই প্রকল্পে ইউনোকল শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন করবে; শাহবাজপুর থেকে খুলনা পর্যন্ত ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইন তৈরি করবে; চারটি নানা আকারের গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করবে। ফলে শিল্প-কলকারখানার ব্যাপক উন্নতি হবে ইত্যাদি যুক্তি দিয়েই সরকার আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকল। এর মধ্যে পেট্রোবাংলার বিশেষজ্ঞগণ ভালোভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত টানলেন যে ইউনোকল আসলে এক মহা ধাপ্পাবাজির প্রকল্প বাংলাদেশকে গেলানোর চেষ্টা করছিল। তাঁরা বললেন–১. শাহবাজপুর থেকে খুলনায় গ্যাস নিতে ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইনের দরকার নেই; কেননা এই মাপের লাইনে সরবরাহ করার মতো পর্যাপ্ত গ্যাস সে সময় শাহবাজপুরে আছে তেমনটি জানা ছিল না। ২. ভালো হয় যদি শাহবাজপুরে গ্যাসক্ষেত্রের কাছে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে ওভারহেড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে খুলনায় বিদ্যুৎ পাঠানো হয়; পেট্রোবাংলার মতে তাতে লাভ বেশি; খরচ কম। ৩. আসলে এত মোটা পাইপলাইন তৈরি করার মূল কারণ হচ্ছে ভারতে গ্যাস রপ্তানি করার কাজে আরো এগিয়ে যাওয়া; অধিক পরিমাণ গ্যাস যদি খুলনার এসেই যায় আর তা ব্যবহারের কোনো ক্ষেত্র যদি খুলনায় না থাকে তাহলে ভারতে রপ্তানি বিষয়ে সরকারকে চাপ দিতে পারবে।[১২] তাছাড়া এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতের জন্য গ্যাস রপ্তানির অবকাঠামো তৈরি হয়ে থাকবে। আর এ ধরনের কাজে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিদেশি কোম্পানির দেশীয় তাঁবেদার এজেন্টের অভাব নেই (স্মরণ করুন, ২০০১-০৩ সালের দাপুটে বয়ান : বাংলাদেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে; মাটির নিচে গ্যাস রেখে পচিয়ে লাভ কী; গ্যাস রপ্তানি করে অধিক বিদেশি মুদ্রা অর্জিত হবে ইত্যাদি)।[১৩] ২০০১-০৩ সালের গ্যাস রপ্তানি বিষয়ক কর্মতৎপরতায় বাংলাদেশের মানুষ তা খালি চোখে দেখতে পেয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতাদের; গ্যাস যদি বাংলাদেশে থাকে তাহলে তা তো দেশের শিল্প-কলকারখানার কাজে লাগবে; অথচ তারাই ঢোলের আওয়াজ বেশি দিয়েছে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে।[১৪] একই কাজ তারা করেছে ফুলবাড়ী খনি নিয়ে; তাদের ধারণা ফুলবাড়ীর কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে; তাতে তাদেরই লাভ হবে; কিন্তু মূল প্রকল্প এবং এ সম্পর্কিত বিনিয়োগ চুক্তি হচ্ছে ৮০-১০০ ভাগ কয়লা বিদেশে বিক্রি করার।[১৫] যা হোক, শাহবাজপুর পরে রক্ষা পেয়েছে। আজ এটি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের নিজেদের মালিকানায় একটি মাঝারি সাইজের গ্যাসক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে আর সুলভে তার নাগরিকগণ গ্যাস পাচ্ছে। সম্প্রতি বাপেক্স সেখানে আরো গ্যাস মজুদের সন্ধান পেয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো মাগুরছড়ার অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী মার্কিন কোম্পানি থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় না করে তার স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী একটি সম্পূরক চুক্তির আলোকে সামান্য অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা করা। এমনকি জ্বালানি বিষয়ক সংসদীয় কমিটির তল্লাশির জবাবে দায়ী মার্কিন কোম্পানিকে প্রোটেকশন দেয়া সে সময়ের সরকারপ্রধানের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সংসদীয় কমিটির কাজে হস্তক্ষেপ করেন জ্বালানিমন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী; ফলে ওই মার্কিন কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সংসদীয় কমিটিতে হাজির হতে হয়নি; প্রধানমন্ত্রীর এরূপ হস্তক্ষেপে সংসদীয় কমিটি খুবই অবাক হয়েছে।[১৬] এই সব কিছুর ফল দাঁড়িয়েছে দাবীকৃত ৩৯০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের বিপরীতে বাংলাদেশ ৩০ জুন ২০১৬ নাগাদ মাত্র ১২ কোটি টাকা পেয়েছে।[১৭] সম্ভবত এমনটি আঁচ করতে পেরেই প্রয়াত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান ২০০১ সালে দেয়া এক বক্তৃতায় এ বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বহুজাতিক কোম্পানির চতুর চালাক অভিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে পেরে ওঠার মতো দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে জ্বালানিসম্পদ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে অতি সাবধানে পদক্ষেপ নিতে হবে।[১৮]

বাংলাদেশের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি এবং দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আরেকটি বড় 'কুড়াল মারা' কর্মের স্বাক্ষর। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রকল্প শুরু থেকেই একটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকল্প ছিল।[১৯] বাংলাদেশে 'ক্রনিজম'-এর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে এটি। আশির দশকের মাঝামাঝি এই খনি আবিষ্কারের পর নানা স্টাডি করে যখন আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতির খনি করার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে, তখন পেট্রোবাংলা হিসাব-নিকাশ করে দেখিয়েছে যে এই প্রকল্পের ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন মাত্র ১৩ শতাংশ। সরকারের নীতি অনুযায়ী কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন যদি ৪০ শতাংশের কম হয় তাহলে তার অনুমোদন দেয়া হয় না। এরকম একটা নিয়ম ওই সময় চালু ছিল। কিন্তু যেহেতু এ প্রকল্পের সম্ভাব্য সুবিধাভোগী হিসেবে এক শক্তিশালী চক্র কাজ করেছে সরকারের ভেতরে ও বাইরে, তাদের অব্যাহত চেষ্টায় পেট্রোবাংলাকে হিসাব-নিকাশ পরিবর্তন করে গোঁজামিল দিয়ে প্রায় ৩৯ শতাংশ ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন দেখাতে হয়েছে এবং সরকার এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে।[২০] শুরু থেকেই খনির প্রতিটি পদক্ষেপ এতই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল যে কয়লাখনির ডিজাইনের দুর্বলতা মেনে নেয়া, উৎপাদন মাত্রা কমিয়ে আনা, ঠিকাদার নিয়োগে সীমাহীন দুর্নীতি করা, পরিবেশের ক্ষতির দিকে নজর না দেয়া, ভূমিধ্বস বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকা বা এড়িয়ে যাওয়া–এর সবই করতে হয়েছে শুধু যে কোনো মূল্যে কয়লাখনি করার জন্যই। খনিমুখে একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র করে এবং সরকারি নানা সংস্থার অহেতুক অংশগ্রহণ দেখিয়ে এর ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন বাড়ানো হয়েছে। অথচ আখেরে লাভবান হয়েছে একটা স্থানীয় ও বৈশ্বিক মুৎসুদ্দি গোষ্ঠী। আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী, যাঁর আমলে এসব কর্ম হয়েছে, জ্বালানিমন্ত্রী হিসেবে তিনি এখন এ বিষয়ে মামলা মোকাবেলা করছেন। অন্যদিকে বড়পুকুরিয়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্র করার জন্য সরকার বিশ্বব্যাংকসহ অন্যদের কাছে ঋণ চেয়েছে। বিশ্বব্যাংক হিসাব-নিকাশ করে দেখিয়েছে যে কয়লাভিত্তিক এই কেন্দ্র থেকে যে দামে বিদ্যুৎ তৈরি হবে তা গ্যাস বা অন্যান্য জ্বালানি দিয়ে তৈরি বিদ্যুতের চেয়েও বেশি হবে। তারা এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের হিসাব-নিকাশকে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হিসেবে দেখেনি।[২১] তাই তারা ঋণ দিতে আগ্রহী হয়নি। যেহেতু ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন বাড়ানোর জন্য এ কেন্দ্র থাকতেই হবে, তাই বিদ্যুতের দাম কম বা বেশি যা-ই হোক এ প্রকল্প চালিয়ে যেতেই হবে। সেজন্য বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে যাঁরা বিনিয়োগ করেন বা ঋণ দিয়ে থাকেন, তাঁরা কেউ এই প্রকল্পে বিনিয়োগ না করলেও সরকার দমে যায়নি। বরং স্থানীয় মুৎসুদ্দি গোষ্ঠী, যারা এর লাভ কুড়িয়েছে, তারাই চীন থেকে সাপ্লাইয়ারস ক্রেডিট সিস্টেমের মাধ্যমে চড়া সুদের ঋণের ব্যবস্থা করেছে। অথচ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের দায়িত্ব অর্থের উৎসের সন্ধান করা। এ এক অপূর্ব ব্যবস্থা! যারা লুটে খাবে তারাই চড়া সুদের ঋণের অর্থের সংস্থান

করেছে। বড়পুকুরিয়া খনি ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতিটি পদক্ষেপে রাজনৈতিক কানেকশনে থাকা ওই স্থানীয় মুৎসুদ্দি গোষ্ঠী এক ধরনের সার্ভেইল্যান্সের মতো কাজ করে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে; ফলে জাতীয়ভাবে লাভ-লোকসানের দিকে নজর দেয়ার সুযোগ সরকারি কর্মকর্তাদের ছিল না। ২৫০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র হলেও শুরু থেকেই ১২৫ ইউনিটের বেশি কাজ দেয়নি; ১২৫ ইউনিট অনেক দিন বন্ধই ছিল; সব সময় এর আংশিক ব্যবহার হয় মাত্র। আদতে এটি একটি অত্যন্ত নিম্নমানের বিদ্যুৎ প্রকল্প হিসেবে জ্বালানি মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে। খুব শিগগিরই এটি বাতিলের কাতারে যাবে বা এর ব্যয়বহুল সংস্কারের প্রয়োজন হবে। সম্প্রতি জানতে পারলাম, চীনের যে কোম্পানি এটি বানিয়েছে, তারা আবার সাপ্লাইয়ারস ক্রেডিটের মাধ্যমে ঋণের বন্দোবস্ত করে বসে আছে; ডাক পেলেই কাজে নেমে পড়বে, যেমনটি তারা এটি বানানোর সময় করেছে। আজ অবধি বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি আর্থিক দিক থেকে লাভজনক কি না তা নিয়ে কোনো অর্থনৈতিক সমীক্ষা চোখে পড়েনি।

ভুঁইফোড় কোম্পানি এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প সাম্প্রতিক সময়ে 'কুড়াল মারা' কর্মের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য। তবে গণ-আন্দোলনে আপাতত এটি থেমে আছে; যে সর্বনাশা গতিতে তা শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালে তা গণ-আন্দোলনে ঠেকানো গেছে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়ের সরকার এতে জড়িত ছিল। ১৯৯৪ সালে সে সময়ের খনি বিধিমালায় বর্ণিত রয়ালটির হার না মেনে বিএনপি সরকার অস্ট্রেলীয় কোম্পানি বিএইচপির সাথে চুক্তি করে। ১৯৯৭ সালে খনি আবিষ্কার করে কয়লার গভীরতা বেশি হওয়ায় উন্মুক্ত খনি করার অসুবিধা দেখে বিএইচপি বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়[২২] এবং বিএইচপির দুই সিনিয়র ম্যানেজারের দ্বারা সদ্য তৈরি হওয়া এশিয়া এনার্জির কাছে হস্তান্তর করার জন্য ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে।[২৩] সরকারের উচিত ছিল আগের আমলে সম্পাদিত চুক্তি পর্যালোচনা করা; একে আইনি কাঠামোর সাথে মিলিয়ে ঠিক করা। এটি তো করেইনি; বরং কার কাছে এই খনি হস্তান্তর করার জন্য বিএইচপি অনুরোধ করেছে তা-ও ভালোমতো তলিয়ে দেখেনি। এতে কি জ্বালানি খাত ব্যবস্থাপনায় এ দুই প্রধান দলের অদ্ভুত মিল প্রমাণ হয় না? এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ওই সময়ে বাংলাদেশে জ্বালানিসম্পদ বিষয়ে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও বাজারের বাইরে নাগরিক সমাজ থেকে 'প্রশ্ন তোলার' তেমন কোনো উদ্যোগ ছিল না। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটির মতো সামাজিক আন্দোলন তৈরির সংগঠনের অস্তিত্ব না থাকায় এসব কাজ আমলা ও রাজনৈতিক এলিটগণ অতি সহজে করতে পেরেছেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে বাংলাদেশের কৃষিজমি (যা প্রতিবছরই কমছে) নষ্ট করে পরিবেশবিধ্বংসী উন্মুক্ত কয়লাখনি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ২০০৫ সাল থেকে স্থানীয় মানুষ এবং পরে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এতে যোগ দিয়ে তাদের দাবিগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে; বিপুল মানুষের জীবন-জীবিকা একটি বিদেশি কোম্পানির কর্পোরেট স্বার্থে ধ্বংস হতে পারে না, সেটা নীতিনির্ধারকগণ ১০ বছর পরে মুখে হলেও স্বীকার করেছেন। একই সাথে ভূগর্ভের পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খনি কোম্পানির ভেল্কিবাজি (যা কোম্পানির দলিল-দস্তাবেজেই [গ্রাউন্ডওয়াটার মডেলিং বিষয়ক প্রতিবেদন দেখুন] পাওয়া যায়) স্বীকার করতেও সরকারের বেশ সময় লেগেছে। জমি ও পানি–বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার এ দুই ক্রিটিক্যাল উপাদান কোম্পানির কর্পোরেট স্বার্থে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না; দেরিতে হলেও বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকগণ এটি স্বীকার করেছেন।[২৪] শক্তিশালী গণ-আন্দোলন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জারি থাকায় তাঁরা এই চাপ বোধ করেছেন। অথচ এই ১০ বছরে নানাভাবে এই 'কুড়াল মারা' প্রকল্প এগিয়ে নেয়ার কাজ সরকারের নীতিনির্ধারকগণ করেছেন। বাজেট বিল থেকে শুরু করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং পরিকল্পনা কমিশনের দলিলপত্রে এর ভূরি ভূরি নজির মেলে। ২০০৭-০৮ সালে সেনা নিয়ন্ত্রিত কেয়ারটেকার সরকারের আমল থেকে এর যাত্রা শুরু। সে সময় জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলা নানা উদ্যোগ নেয়; মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'খনি ও স্থানীয় মানুষের জীবিকা' শীর্ষক সেমিনারে এশিয়া এনার্জি অস্ট্রেলিয়া থেকে 'বিশেষজ্ঞ' নিয়ে আসে কিভাবে স্থানীয় কমিউনিটির কল্যাণে কয়লা প্রকল্পকে কাজে লাগানো যায় এটা দেশবাসীকে জানানোর জন্য। এ সময় ইউএসএআইডির জ্বালানি বিষয়ক 'সারি' প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে ইউএনডিপি-বাংলাদেশও কোম্পানির পক্ষে লবির কাজ করে।[২৫] সরকারের অভ্যন্তর থেকে প্রাপ্ত উস্কানিতে ২০১২ সালে এই লবি আরো শক্তিশালী হয়; এর ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায় তৈরি পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ২০১২ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ২০১৪ সাল থেকেই ফুলবাড়ী খনি থেকে কয়লা উত্তোলিত হবে।[২৬] এর পূর্বে ২০১১ সালে প্রস্তুতকৃত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-১৫) জ্বালানি খাতের জন্য সরকারি অগ্রাধিকারমূলক তিনটি স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা হয়; এর একটি হলো উন্মুক্ত খনির পক্ষে কয়লা অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।[২৭] সবচেয়ে অবাক করা ভূমিকা রেখেছে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় প্রতিনিধিদল, যারা ওই সময়ে জার্মানি ঘুরে এসে সুপারিশ করেছিল যে জার্মানির মতোই বাংলাদেশের ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত খনি করা যাবে।[২৮] তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রীও ২০০৯ সালে জার্মানির কয়লাখনি ঘুরে এসে সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছেন উন্মুক্ত খনির পক্ষে। বলা দরকার, এসব সফর খনি কোম্পানি ও জার্মান সাহায্য সংস্থার (জিআইজেড) স্পন্সরে হয়েছে, যাদের উভয়ের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা আছে ফুলবাড়ী প্রকল্পে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে তাদের সুপারিশের একেবারে উল্টো। সরকারি পর্যালোচনা কমিটি, আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞগণ বারবার বলে এসেছেন যে জার্মানি ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিকভাবে তুলনীয় নয়। ভাবা যায় যে একটা দেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটি নিজ দেশের মঙ্গল কিসে হবে তাতে মনোনিবেশ না করে কর্পোরেট স্বার্থে বুঁদ হয়ে ছিল!

অবশ্য জ্বালানিমন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বলেছেন, পরিবেশ ও কৃষিজমির কথা ভেবে উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লাখনি বাংলাদেশে করা হবে না। যদিও তিনি নিজেই প্রথম এ আলোচনার সূচনা করেন ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে বড়পুকুরিয়ায় উন্মুক্ত খনি করার নির্দেশনা দিয়ে। তিনিই আবার ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে আরেকটি নতুন ধারণা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে জনপরিসরে হাজির করেন যে স্থানীয় কয়লা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে দেয়া হোক; তাঁর মতে সামনের দিনে এমন কোনো প্রযুক্তি তৈরি হতে পারে, যা দিয়ে জমি, জলা, পরিবেশ, মানুষের জীবিকা ইত্যাদির ক্ষতি না করে কয়লা তোলা সম্ভব হবে। এতে অবশ্য খুব স্বস্তি পাওয়ার কারণ নেই। কেননা সরকারের নীতি বিষয়ক দুটি মূল দলিলে [সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : ২০১৬-২০ (পাতা-৩৪৫) এবং ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা (পাতা-৩৪ ও ৩৫)] দেশীয় কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রাথমিক জ্বালানির সংকট কাটানোর কথা বলা হয়েছে। ফলে সরকার অ্যাডহক ভিত্তিতে আমদানীকৃত কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বললেও দীর্ঘমেয়াদি নীতি হিসেবে দেশীয় কয়লা উত্তোলনের ওপরই ভরসা রাখছে। তবে আমি দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে বলতে পারি, ওই দলিলের বর্ণিত এ নীতি অবস্থান ঠিক থাকবে না। কেননা কয়লা অঞ্চলের স্থানীয় গণ-আন্দোলন ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন এ নীতি অবস্থানকে এর আগেও অসার প্রমাণ করেছে। ২০১০ সালের ২০ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (যাতে বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ ভাগ বিদ্যুৎ দেশীয় কয়লা দিয়ে তৈরি হবে) তাই তিন বছরের মাথায় পরিত্যক্ত হয়েছে। ২০১৬ বিদ্যুৎ পরিকল্পনা নিয়েও ইতিমধ্যেই অনেক সমালোচনা উঠেছে। জাতীয় কমিটি এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে বিকল্প প্রস্তাবনা হাজির করেছে।

২০১২ সালে সরকার এশিয়া এনার্জিকে 'জনমত' গঠনের জন্য ফুলবাড়ী পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। গণপ্রতিরোধ ৬ বছর আগের চেহারায় আবার জ্বলে ওঠে; সরকার পিছু হটে। এশিয়া এনার্জির লবিতে বড়পুকুরিয়া নিয়ে জ্বালানিমন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী) থেকে শুরু করে অনেকেই গোলমেলে কথাবার্তা বলেছেন ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। অবশ্য গত দুই বছরে (২০১৪ থেকে ২০১৬) সরকারের খনিবিষয়ক (ফুলবাড়ী ও বড়পুকুরিয়া) নানা সিদ্ধান্ত[২৯] থেকে বলা যায়, উন্মুক্ত খনি প্রকল্পের মৃত্যু[৩০] ঘটেছে, যদিও সরকার এশিয়া

এনার্জির সাথে এ সম্পর্কিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয়নি।[৩১]

এরই ধারাবাহিকতায় রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিষয়টিও দেখা যেতে পারে। উল্লেখ করা দরকার যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ (পলিসি লিডারশিপ)' পুরস্কার পেয়েছেন। ওই পুরস্কার গ্রহণের প্রাক্কালে ইউএনইপিকে দেয়া এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শেখ হাসিনা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক নীতি ও কর্মযজ্ঞে পরিবেশ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ওই বক্তব্যে 'ইকোব্যালান্স'-এর কথা তিনি দুবার উল্লেখ করেছেন। উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে (সাধারণ) বন ও ম্যানগ্রোভের (বনের) কোনো ক্ষতি যাতে না হয় সে বিষয়ে তিনি সতর্ক করেছেন। ২০১১ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে 'পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি (সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে উলেখ করা হয় : "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"

কিন্তু সুন্দরবন নিয়ে সরকারের কর্মকাণ্ড মনে করিয়ে দেয় আশির দশকের শুরুর দিকে শামসুর রাহমানের লেখা একটি কবিতার শিরোনাম : 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'। রাহমানের এ কবিতাটির কথা মনে হলো রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি সুন্দরবন বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় পরিবেশ কমিটির সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত দেখে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এই কমিটির এক সভা সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কিলোমিটার অঞ্চলের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় ৩২০টি শিল্প-কারখানাকে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে।[৩২] বিদ্যমান পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫/২০১০) ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৬) অনুযায়ী সুন্দরবনঘেঁষা ওই এলাকায় এমন উদ্যোগ নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও কমিটি আগে থেকেই ওই এলাকায় থাকা (অবৈধ) ১৮৬টি শিল্প-কারখানাকে বৈধ করে অনুমোদন দিতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫/২০১০) অনুযায়ী সুন্দরবনের রিসার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। ২০১৫ সালে সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করা বিষয়ক গেজেট (২০১৫ সালের ১৩ জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয়; পরে ২০১৭-র ২৪ মে সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়) প্রকাশের পর পরিবেশ অধিদপ্তর ওই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ১১৮টি শিল্প-কারখানাকে প্রাথমিক ছাড়পত্র দিয়েছিল; জাতীয় পরিবেশ কমিটি সেগুলোও নবায়ন করতে বলেছে। অর্থাৎ যত অবৈধ শিল্প-কারখানা সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় আছে তার সবই আইনসিদ্ধ করে নিতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে পরিবেশ রক্ষার নিমিত্তে তৈরি করা জাতীয় পরিবেশ কমিটি। অথচ ২০১৭-র ২৪ মে প্রকাশিত গেজেটে (নং-২২.০০.০০০০.০৭৩.১৩. ০০৪.২০১৪-১৩৬, পাতা-৬০৯৮) পরিষ্কার করে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় তালিকাভুক্ত মৌজাসমূহে যেসব কাজ নিষিদ্ধ থাকবে বলে উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে আছে : 'মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন'।

আইনগতভাবে নিষিদ্ধ এলাকায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেয়ার এবং অবৈধ শিল্প-কারখানাকে বৈধ করে নেয়ার এহেন 'আইনবিরোধী' পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরিবেশ কমিটি প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার ও তাতে প্রদত্ত বক্তব্য বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। সরকারি ভাষ্য মতে দেশের শিল্পায়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের জন্য এসব শিল্প-কারখানার অনুমোদন দেয়া হয়েছে (প্রথম আলোর প্রতিবেদন দেখুন)। এতে প্রতীয়মান হয় যে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক নীতি ও কর্মযজ্ঞে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে ইকোব্যালান্স বজায় রাখার কথা প্রধানমন্ত্রী ইউএনইপিকে জানিয়েছেন এবং সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে সংযুক্ত করেছেন তা পুঁজির ধাক্কায় অতলে হারিয়ে গেছে। তথাকথিত উন্নয়নের নেশায় মত্ত তাঁর সরকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কায়েমি স্বার্থ রক্ষায় ম্যানগ্রোভ বনের ক্ষতি উপেক্ষা করার মতো ভয়াবহ পদক্ষেপ নিয়েছে। গত জুলাই (২০১৭) মাসে বাংলাদেশের সরকার ইউনেস্কোর বৈশ্বিক সম্মেলনে অঙ্গীকার করেছে যে সুন্দরবন রক্ষার জন্য বিশেষ একটা পরিবেশ সমীক্ষা না করা পর্যন্ত কোনো ধরনের বড় শিল্প-কারখানা ওই এলাকায় গড়ে তুলতে দেয়া হবে না। অথচ এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে ওই অঙ্গীকার পাল্টে গেল। নিয়ম রক্ষার্থে সরকারি আদেশে বলা হয়েছে যে এসব শিল্প-কারখানায় পরিবেশের সুরক্ষামূলক কঠোর ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (প্রথম আলোর প্রতিবেদন দেখুন)।[৩৩]

গত কয়েক দশকের কয়েকটি প্রকল্পে সরকারি কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে এক্ষেত্রে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটিসহ বাংলাদেশের জনগণের বিভিন্ন অংশের এক বিশাল ভূমিকা আছে, যাতে সরকার সব ক্ষেত্রে 'কুড়াল মারা' কর্ম করতে সক্ষম হয়নি। তারা একটা শক্তিশালী 'ওয়াচডগ'-এর ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিবিয়ানার গ্যাস রপ্তানি প্রতিহত করা, ফুলবাড়ীর উন্মুক্ত খনি ঠেকানো, টাটার খনি বিষয়ক বিনিয়োগ প্রস্তাব ভণ্ডুল করে দেয়া–এগুলো এসব আন্দোলন/কর্মতৎপরতার সাফল্য। এই আন্দোলন প্রতিরোধ চেতনা অব্যাহত আছে এটাই আশার কথা।

এ আলোচনাটি শেষ করব সাম্প্রতিক একটি তৎপরতা নিয়ে আলোকপাত করে। বিষয়টি হল মার্কিন কোম্পানি শেভরন'র বর্তমান কিছু পদক্ষেপ। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান তথা বিদেশী কোম্পানীর সাথে পিএসসি ভিত্তিক লেনদেন নিয়ে বাংলাদেশের জনপরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তর্কবিতর্ক শুরু হয় ১৯৯৯ সন থেকে মূলত সদ্য গঠিত তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির কর্মতৎপরতার কারণে। ২০০৭-২০০৮ সালে পিএসসি নিয়ে আবার আলোচনা দানা বেঁধে উঠে তেল-গ্যাস রপ্তানির বিধান রেখে 'মডেল পিএসসি' তৈরি ও কনকো ফিলিপস-এর সাথে চুক্তির কারণে। ২০১২ সালের সংশোধিত পিএসসি নিয়ে ও একই রকম অবস্থা তৈরি হয়েছে। এসব বিতর্ককে এবং তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'র কর্মকান্ডকে অনেক সময় কোণঠাসা করার চেষ্টা দেখা যায় এ যুক্তিতে যে সরকারই গ্যাসক্ষেত্রের মালিক থাকছে; বিদেশী কোম্পানী শুধুমাত্র 'ঠিকাদার' হিসাবে কাজ করে এবং কোন গ্যাস রপ্তানি করার আগে পেট্রোবাংলা'র অধিকার আছে তা কেনার; পেট্রোবাংলা কেনায় আগ্রহ না দেখালেই ('দ্য রাইট অব ফার্স্ট রিফিউসাল') ঐ কোম্পানি রপ্তানির চেষ্টা করবে। এ যুক্তির অসারতা প্রমানের জন্য গোঁজামিলের যুক্তি দাঁড় করাবার নানা চেষ্টা দেখা গেছে অতীতে।

সম্প্রতি শেভরন বাংলাদেশে তার ব্যবসার পরিবর্তন করা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ফলে ঐ গোঁজামিলের যুক্তির অসারতা পরিষ্কার হচ্ছে। খবরে জানা যায়, শেভরন বাংলাদেশের ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে এবং চীনা এক কোম্পানির (যাতে চীন সরকারের মালিকানাও আছে) কাছে সব বিক্রি করে বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে।[৩৪] বাংলাদেশের সরকার "জাতীয় স্বার্থে" শেভরনের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ কিনতে চেয়ে যাচাইবাছাই করার জন্য আন্তর্জাতিক কন্সাল্ট্যান্ট নিয়োগ করেছেন; ঐ কন্সাল্ট্যান্ট এর কাজ চলমান থাকার মধ্যেই শেভরন চীনের ঐ কোম্পানীর কাছে বাংলাদেশে থাকা তার সব সম্পদ বিক্রি করেছে বলে খবর বের হয়।[৩৫] এ খবর বেরুলে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি বিষয়টি জানেননা।[৩৬] রয়টার্সের সাথে এক সাক্ষাতকারে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে শেভরন গ্যাসক্ষেত্রসমূহ বিক্রি করতে চাইলে বাংলাদেশের সরকার ক্রেতা হিসাবে "প্রথম আগ্রাধিকার" পাবার কথা।[৩৭] উল্লেখ করা দরকার যে এসব বিষয়ে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী যথাযথ মাধ্যমে শেভরন থেকে নয় বরং মিডিয়া থেকে জেনেছেন বলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।[৩৮] রয়টার্সের সাথে আলাপকালে পেট্রোবাংলার একজন পরিচালকও জানিয়েছেন যে শেভরনের সম্পত্তি বেচাকেনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের 'দ্য রাইট অব ফার্স্ট রিফিউসাল' আছে এবং সম্পত্তি বা গ্যাসক্ষেত্র বেচার জন্য শেভরনকে বাংলাদেশের অনুমতি নিতে হবে।[৩৯]

বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং শেভরন পেট্রোবাংলার 'কেনার অধিকার' বিষয়ক দাবি নাকচ করে চীনের কোম্পানির কাছে গ্যাসক্ষেত্র/সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে এবং এটি অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলার সাথে এক রুদ্ধদ্বার আলোচনা করেছে। এক সংবাদে জানা যায় যে পেট্রোবাংলা বেঁকে বসেছে; পেট্রোবাংলার সাবেক কর্মকর্তাগণ জানালেন শেভরন বেআইনি কাজ করছে।[৪০] বাংলাদেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথে বিদেশী কোম্পানীসমূহের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও বিপনন চুক্তি কি এমন ভাবেই হয় যে সরকারকে না জানিয়ে কিংবা আইন সম্মত নয় এমন কাজ করে এমনকি জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বর্ণিত "ক্রেতা হিসাবে বাংলাদেশের প্রথম আগ্রাধিকার পাবার" বিষয়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তারা ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে পারে? এক পর্যায়ে বলা হয় যে, সরকারের চাপে[৪১] শেভরন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে[৪২]। তবে শেভরন বাংলাদেশে ব্যবসা চালিয়ে যাবার বিনিময়ে কয়েকটি শর্ত সম্বলিত একটি প্রস্তাব সরকারকে দিয়েছে; সরকার প্রস্তাবের একটি শর্ত মেনে নিয়েছে; বাকিগুলো নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। শর্তগুলো হচ্ছেঃ ১২, ১৩, ১৪ নম্বর ব্লকে যেখানে শেভরন কাজ করছে তাতে নতুন করে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য অনুমতি প্রদান ও এজন্য পিএসসি'র মেয়াদ ১০ বছর বাড়ানো; বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রে নতুন কম্প্রেসার বসানোর অনুমতি প্রদান; এবং জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে থ্রিডি জরীপ না করা।[৪৩] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তৃতীয় শর্ত দিয়ে শেভরন কার্যত সরকারী সংস্থা, বাপেক্সের ঐ অঞ্চলে গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ সীমিত করে দিতে চায়।

সরকার যদি শেভরনের এ প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে বোঝা যাবে পুরো বিষয়টি ছিলো সাজানো। এবং এই সিদ্ধান্তকেও আরেকটি 'কুড়াল মারা' পদক্ষেপ হিসাবেই চিহ্নিত করা যাবে।

লেখক: টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচডি গবেষক।
ই-মেইল: omarsoc@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন বদরুল ইমাম (১৯৯০) বাংলাদেশে তেল সম্ভাবনা ও হরিপুর তেল বিতর্ক (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

২. দেখুন মো. নুরুল ইসলাম (২০০৬) 'কাফকো থেকে টাটা : বিদেশি প্রকল্পে দেশি গ্যাস, কার লাভ?' (দৈনিক সমকাল, ৩১ মে থেকে ৯ জুন [চার পর্বের নিবন্ধ])।

৩. বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতারাও এটিকে অসম চুক্তি মনে করে দেশের স্বার্থ পরিপন্থী হিসেবে জনসমক্ষে সমালোচনা করেছেন। দেখুন বিডিনিউজ২৪.কম (২৮ আগস্ট ২০০৬)।

৪. এ বিষয়টি ২০১৬ সালে ঢাকার এক টেলিভিশন চ্যানেলে টকশোতে আলোচনার সময় উল্লেখ করেছেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব, যিনি ওই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

৫. আফ্রিকা মহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই লুটপাটের মহোৎসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন টম বারগিস (২০১৫) দ্য লুটিং মেশিন (লন্ডন : উইলিয়াম কলিন্স)।

৬. আগ্রহী পাঠক এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে তেল-গ্যাস বিষয়ক আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন অয়েল অ্যান্ড গ্যাস জার্নালের ১৯৯৩ ও ১৯৯৫ সালের কয়েকটি সংখ্যা দেখতে পারেন।

৭. এ জন্য দেখুন নিকোলাস সুলিভান (২০০৭) ইউ ক্যান হিয়ার মি : হাউ মাইক্রোলোনস অ্যান্ড সেলফোনস আর কানেক্টিং দ্য ওয়ার্ল্ডস পুওর টু দ্য গোবাল ইকোনমি (লন্ডন : জন উইলি অ্যান্ড সন্স), পাতা-৭৪।

৮. UNCTAD. 2004. Disclosure of the Impact of Corporations on Society: Current Trends and Issues. New York: United Nations, P. 57.

৯. এ নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনার জন্য দেখুন মাহমুদুর রহমান (২০০৭) জাতির পিতা ও অন্যান্য (ঢাকা : কাশবন প্রকাশন), পাতা : ৬৬-৭১। উল্লেখ্য, রহমানের বিশ্লেষণে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকলেও তাঁর লেখার গুরুত্ব এই যে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা থাকার দরুণ তিনি সরকারি গোপন দলিল-দস্তাবেজের তথ্য জানেন এবং তাঁর লেখায় সেসব তুলে ধরেন। অন্যথায় এসব গোপনীয় তথ্য জানার কোনো সুযোগ নেই।

১০. দেখুন Steve Coll (2012), Private Empire: ExxonMobil and American Power. New York: Penguin.

১১. ডেইলি স্টার, ১৭ আগস্ট ২০০৩ (প্রথম পাতা)।

১২. শাহবাজপুর প্রকল্প বিষয়ে এসব তথ্য ওই সময়ে প্রকাশিত তেল-গ্যাস বিষয়ক আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন অয়েল অ্যান্ড গ্যাস জার্নাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আনু মুহাম্মদ (২০০৬) বাংলাদেশের তেল-গ্যাস কার সম্পদ কার বিপদ (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন)।

১৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম (২০০১) জ্বালানি সমস্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (ঢাকা : গণপ্রকাশনী)।

১৫. অবশ্য ফুলবাড়ী হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতাগণ আন্দোলনকারীদের দাবির যথার্থতা জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন (দেখুন, প্রথম আলো, ৩০ আগস্ট ২০০৬, পাতা-১৬)।

১৬. ডেইলি স্টার, ৫ জানুয়ারি ২০০১, পাতা-১ ও ১১।

১৭. ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ২৭ অক্টোবর ২০১৬।

১৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৮) বাজার ও অদৃশ্য হস্ত (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী), পাতা-৪৯।

১৯. ডেইলি স্টার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ('এ মাইন অব করাপশন')।

২০. ডেইলি স্টার, ১৮ জানুয়ারি ২০০৯, শাহরিয়ের খান 'বড়পুকুরিয়া কোল মাইন'

২১. World Bank (2003) Bangladesh Public Expenditure Review (Report No. 24370-BD), p. 100.

২২. আমি এ তথ্য পেয়েছি সরকারি দলিল-দস্তাবেজের পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালকের দেয়া বক্তব্য থেকে (দেখুন, ডেইলি স্টার, ২৮ আগস্ট ২০০৬, পাতা-১, শাহরিয়ের খান, 'এগ্রিমেন্ট উইথ এশিয়া এনার্জি')।

২৩. এ নিয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দেখুন ওমর ফারুক (২০১৬) 'কয়লাখনির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও জ্বালানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা' (বণিক বার্তা, ২৬ আগস্ট, পাতা-৪)।

২৪. ২০১৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী ও জ্বালানিমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিজমি রক্ষার জন্য এ ধরনের খনি প্রকল্প থেকে সরে আসার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে ২০০৬ সালে ফুলবাড়ী হত্যাকাণ্ডের পর আন্দোলনকারীদের সাথে সরকারের সম্পাদিত 'উন্মুক্ত খনি বিরোধী চুক্তি'র প্রতি জনসমক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেন। তবে এখনও ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। এখনও কোম্পানি সরকারের ভেতর থেকে নানা আশ্বাস ও প্রশ্রয় পেয়ে শেয়ার মার্কেটে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

২৫. দেখুন ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন, 'Use 2.5b tonne coal for energy security; Recommends UNDP-Bangladesh report' (১ জুন ২০০৮)।

২৬. দেখুন পরিবেশ মন্ত্রণালয় (২০১২) Bangladesh-Rio + 20: National Report on Sustainable Development, পাতা-৬০।

২৭. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) [পার্ট-২]।

২৮. ওই সুপারিশে সবচেয়ে অবাক করা যে তথ্য আছে তা শুনলে অনেকেই অবাক হবেন। সংসদীয় কমিটির মতে ভবিষ্যতে কয়লা তোলার ক্ষেত্রে পরিবেশের কথা তুলে জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে; তাই দেরি করা সমীচীন হবে না।

২৯. প্রমাণস্বরূপ সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি সংবাদ প্রতিবেদন আমলে নেয়া যেতে পারে : ১। প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় খনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিষয় সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন এবং আমদানি করা কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে (ডেইলি সান, ১০ এপ্রিল ২০১৫); ২। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, "শেখ হাসিনার সরকার মনে করে, আগে কৃষক, তার জমি এবং তারপর কয়লা। আমাদের কয়লার ওপর বিরাট পানির স্তর আছে; এই পানি ওঠালে আশপাশের এলাকার পানির কী অবস্থা হবে তা দেখতে হবে; এমনটি পৃথিবীর কোথাও নেই। দেশের কয়লা, দেশের কোম্পানি, দেশেই ব্যবহার করব।" (ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি টকশো, আজকের বাংলাদেশ, ১৪ জুন ২০১৫); ৩। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়লাখনি থেকে কয়লা উৎপাদনে সরকার আগ্রহী নয়। তিনি বলেন, সরকার ঘন জনবসতি ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে (নিউ এজ, ২৪ আগস্ট ২০১৫); ৪। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিব জানালেন, সরকার বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত খনি করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে (ডেইলি সান, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬)।

৩০. এশিয়া এনার্জি কোম্পানি এটি মানতে নারাজ; সেজন্য এর ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে শিগগিরই তারা ফুলবাড়ী খনির কাজ শুরু করতে পারবে বলে আশাবাদী। ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনেও তেমন আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩১. এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এশিয়া এনার্জি 'খনির মাঠ' থেকে বিতাড়িত হলেও

'বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা'র (পলিসি আইডিয়া তৈরি ও নীতিনির্ধারকদের গেলানোর কাজে) ক্ষেত্রে বেশ সক্রিয় আছে। এই সক্রিয়তার একটি চেষ্টার কথা উল্লেখ করা দরকার। ডেনমার্কের এক গবেষণা সংস্থা (কোপেনহেগেন কনসেনসাস সেন্টার) বাংলাদেশ নিয়ে করা একগুচ্ছ গবেষণা দলিল প্রকাশ করেছে বেশ কিছুদিন আগে। ওই ঝাঁকের জ্বালানি বিষয়ক স্টাডিতে তারা বলেছে যে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে জলবায়ুর কিছুটা ক্ষতি হলেও আর্থিক খাতে যে অতিরিক্ত বিনিয়োগ হবে তাতে এই ক্ষতি পুষে যাবে। তারা আরো দেখিয়েছে, আমদানীকৃত কয়লার সাথে স্থানীয় কয়লা ব্যবহার করলে বিনিয়োগকৃত প্রতি ১ টাকায় যে সুফল হবে তা শুধু আমদানীকৃত কয়লার ব্যবহারের চেয়েও বেশি। অথচ তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একজন কন্সালট্যান্টের গবেষণাকেই এ কাজে ব্যবহার করেছে এই ডেনিশ গবেষণা সংস্থা। কয়লার সাথে তথা ফুলবাড়ী খনি ও এশিয়া এনার্জির সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সংযোগের কথা অনেকের জানা আছে। ফলে মূল মতলবটা কোথায় নিহিত তা অনুমান করা কঠিন নয়। দেখুন কোপেনহেগেন কনসেনসাস সেন্টারের প্রধান Bjorn Lomborg এর প্রবন্ধ 'Bringing electricity to more Bangladeshis' (ডেইলি স্টার, ২৫ মে ২০১৬)।
আগ্রহী পাঠক বিস্তারিত জানতে দেখুন http://www.copenhagenconsensus.com/publication/bangladesh-priorities- energy-gunatilake-and-roland-holst

৩২. প্রথম আলোর প্রতিবেদন ('সুন্দরবনের গলায় কারখানার ফাঁস'), ১১ আগস্ট ২০১৭।

৩৩. বিদ্যমান আইন উপেক্ষা করে জাতীয় পরিবেশ কমিটির নেয়া এসব সিদ্ধান্ত এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ আন্দোলন আমলে না নিয়ে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নে সরকারের অটল থাকা শুধু সুন্দরবন রক্ষার বিষয়টিকেই হুমকির মুখে ফেলছে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও প্রশাসন বিষয়ক একাডেমিক গবেষণায় অনেক স্কলার দেখিয়েছেন, একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক/প্রশাসনিক কাঠামো তৈরিতে বাধা হিসেবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কায়েমি স্বার্থের জাল কেমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন। এ বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোর আলোকে করা সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে অধ্যাপক আবুল বারকাত উল্লেখ করেছেন যে কায়েমি স্বার্থের এই জাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকেই কবজা (state capture) করে ফেলেছে এবং গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে শক্তিশালী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে (দেখুন আবুল বারকাত, ২০১৬, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা, ঢাকা : মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। শাসনব্যবস্থার এরূপ গলদের জন্যই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণায় উল্লেখিত সামাজিক চুক্তির পূর্ণতা গত চার দশকেও ঘটেনি (এ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন অধ্যাপক রেহমান সোবহানের ঢাকায় প্রদত্ত ২০১১ সালের লোকবক্তৃতা 'বাংলাদেশ অ্যাট ৪০ : লুকিং ব্যাক অ্যান্ড মুভিং ফরোয়ার্ড')।

৩৪. রয়টার্স, এপ্রিল ২৪, ২০১৭

৩৫. রয়টার্স, অক্টোবর ৩১, ২০১৬

৩৬. ঢাকা ট্রিবিউন, মে ১৬, ২০১৭

৩৭. রয়টার্স, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১৭

৩৮. ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এপ্রিল ২৪, ২০১৭

৩৯. রয়টার্স ২৩ মে ২০১৭

৪০. বাংলানিউজ২৪, ১৯ জুলাই ২০১৭

৪১. বণিক বার্তা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রথম পাতা ('গ্যাসক্ষেত্র বিক্রির অনুমতি এখনই পাচ্ছেনা শেভরন')।

৪২. বণিক বার্তা ৩১ অক্টোবর ২০১৭, শেষ পাতা ('বাংলাদেশের ব্যবসা বিক্রিঃ চীনা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আপত্তিতে সিদ্ধান্ত বদলাল শেভরন')।

৪৩. যুগান্তর, ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ ('শেভরন তিন শর্তে বাংলাদেশে থাকছে')।

EPI Environmental Performance Index

পরিবেশ প্রতিবেশ সূচকে তলানির ১০ দেশ

অবস্থান	দেশ	স্কোর
১৭১	মধ্য আফ্রিকা	৩৬.৪২
১৭২	নাইজার	৩৫.৭৪
১৭৩	লেসোথো	৩৩.৭৮
১৭৪	হাইতি	৩৩.৭৪
১৭৫	মাদাগাস্কার	৩৩.৭৩
১৭৬	নেপাল	৩১.৪৪
১৭৭	ভারত	৩০.৫৭
১৭৮	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	৩০.৪১
১৭৯	বাংলাদেশ	২৯.৫৬
১৮০	বুরুন্ডি	২৭.৪৩

সূত্র: বণিক বার্তা, ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮

সর্বজনকথা প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা: আজিজ সুপার মার্কেটের প্রথমা, পাঠক সমাবেশ, জনান্তিক, অভীক, তক্ষশীলা, বিদিত। বেইলি রোডে সাগর পাবলিশার্স।

সিলেট: বইপত্র। ঠিকানা: বইপত্র, ৯০ রাহা ম্যানশন, সিলেট।

দিনাজপুর: বন্ধু পত্রিকা এজেন্সী। ঠিকানা: দিনাজপুর রেলস্টেশনের পাশে।

খুলনা: মৃত্তিকা।

চট্টগ্রাম: বাতিঘর।

যশোর: ১) বইহাট। ঠিকানা: সার্কিট হাউজ রোড, যশোর। ২) বিপি বুক ডিপো। ঠিকানা: মুজিব সড়ক, দড়টানা, যশোর। ৩) আনোয়ার আলম ব্রাদার্স। ঠিকানা: ৭ মুজিব সড়ক, যশোর।

রাজশাহী: চন্দন বুক পয়েন্ট। ঠিকানা: গোল্ডেন প্লাজা, সোনা দিঘীর মোড়।

ময়মনসিংহ: আজাদ অঙ্গন। ঠিকানা: ৪৪/এইচ সিকে ঘোষ রোড।

গাজীপুর: চর্যাপদ। পাঠকের রেস্তোঁরা। কলেজ রোড আউচপাড়া

ফরিদপুর: আনন্দ বিপণি। ঠিকানা: ১১ খান সুপার মার্কেট। (জনতা ব্যাংকের মোড়)।

নরসিংদি: বইপুস্তক। চেয়ারম্যান মার্কেট, পশ্চিম ব্রাহ্মণদি, খালপাড়।

বগুড়া: পড়ুয়া লাইব্রেরি। ঠিকানা: ইউনুস প্লাজা, এম. এ খান লেন। টেম্পল রোড।

সুনামগঞ্জ: 'মধ্যবিত্ত'। ঠিকানা: দোকান নং-৪, পৌর বিপণি, সুনামগঞ্জ।

যোগাযোগ ও বিকাশ নাম্বার: ০১৮৮২৪৩৪৬৬৮